স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

শ্রাবণ ১৪২৩ আগস্ট ২০১৬ | বর্ষ ২৫ | সংখ্যা ১

@icddr_b icddrb company/icddrb www.icddrb.org

অটিজম

চৌধুরী মোঃ গালিব, আইসিডিডিআর,বি

অটিজম মূলত একটি স্নায়বিক সমস্যা যা শিশুর মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা ক্রমান্বয়ে সামাজিক যোগাযোগে অক্ষম হয়ে পড়ে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য, তবে কখনো কখনো কেবল আংশিকভাবে এ-সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পৃথিবীজুড়ে বর্তমানে অটিজমজনিত সমস্যা খুবই ব্যাপক। অটিজমকে সাধারণত রোগ না বলে স্বাস্থ্য সমস্যা বলা হয়ে থাকে। যেসব কারণে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটে তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ অটিজম।

অটিজম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি

অটিজম শব্দটি অনেকের কাছেই এখন আর কোনো নতুন শব্দ নয়। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি ১,০০০ শিশুর মধ্যে ১.৫৫ জন অটিজমে আক্রান্ত। আলাদাভাবে ঢাকা শহরে এ-হার অনেক বেশি—প্রতি ১,০০০ জনে ৩০ জন, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মাত্র ০.৬৮ জন।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ-সমস্যা তেমন প্রকটভাবে দেখা না দিলেও শহরের শিশুদের মধ্যে এই সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

অটিজমের কারণ

অটিজমের সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় করা যায় নি। তবে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন যে, এক্স ক্রোমোজোমের কোনো অস্বাভাবিকতা এর জন্য দায়ী। তাছাড়া শিশুর চারপাশের পরিবেশও অটিজম সমস্যার একটি কারণ বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

অটিজম নির্ণয়

১. প্রথমত বাবা-মাকে শিশুর বিকাশের লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠছে কি না তা লক্ষ রাখতে হবে। কোনো সমস্যা চোখে পড়লে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। সাধারণত দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশু কথা না বললে শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে

একটি অটিস্টিক শিশু ■ সূত্র: ফ্লিকার ক্রিয়েটিভ কমনস ■ ছবি: হেপিংটিং CC BY-SA 4.0

২. অটিজম বিশেষজ্ঞ কিছু লক্ষণ দেখে এবং বাবা-মাকে শিশুর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে অটিজম নির্ণয় করে থাকেন

অটিজমের লক্ষণ

অটিজমের লক্ষণগুলো একেক শিশুর ক্ষেত্রে একেক রকম হলেও কিছু কিছু লক্ষণ প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যেমন:

- দু'বছর বয়স হওয়ার পরও শিশু কথা বলতে না পারা বা দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বলতে না পারা
- চোখে চোখ রাখতে না চাওয়া বা খুব কম ক্ষেত্রে চোখে চোখ রেখে তাকানো
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেওয়া
- খুব অস্থিরতা, যার ফলে শিশু সারাক্ষণ অতিরিক্ত ছুটোছুটি করতে চায়

চিকিৎসা

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিশুর অটিজম চিহ্নিত করতে সক্ষম হলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাধারণত শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হয়, তাই যত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় নিরাময়ের সম্ভাবনাও তত বেশি থাকে।

অটিজম নিরাময়ের জন্যে কোনো ওষুধ নেই। তবে শিশুকে স্বাভাবিক বিকাশ ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু থেরাপি ও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে গৃহীত ব্যবস্থা শিশুর সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে। যেমন:

১. অটিজম বিশেষজ্ঞ প্রথমে শিশুর সমস্যাগুলো ভালোভাবে বুঝে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। এক্ষেত্রে স্পিচ থেরাপিস্ট এবং অকুপেশনাল থেরাপিস্টের প্রয়োজন হতে পারে অথবা বাবা-মাকে কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমেও তাঁদের শিশুর সঠিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে, বিশেষজ্ঞের শেখানো পদ্ধতি অবশ্যই সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে

২. অটিজম বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছু খাবার শিশুকে দিতে নিষেধ করতে পারেন, যেমন গমজাতীয় খাবার, বেশি মাত্রায় চিনি, গরু বা ছাগলের দুধ, ইত্যাদি। এগুলো খাওয়ার সাথে অটিস্টিক শিশুর আচার-আচরণের সম্পর্ক রয়েছে। এসব খাবার কম খাওয়ালে শিশু কিছুটা শান্ত থাকতে পারে এবং অস্বাভাবিক আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। আস্তে আস্তে তার মধ্যে চোখে চোখ রাখার অভ্যাসও গড়ে উঠতে পারে। এতে শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়ে ধীরে ধীরে তার শেখার আগ্রহও বাড়তে পারে

ভেতরের পাতায়: ডেঙ্গু জ্বর: প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	অধ্যাপক জন ডি ক্লেমেন্স
প্রধান সম্পাদক	ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন
উপ-প্রধান সম্পাদক	ড. রুবহানা রকিব
সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

ডাঃ মোঃ ইকবাল, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

৩. এছাড়াও শিশুর সমস্যার মাত্রা ও ধরন দেখে অটিজম বিশেষজ্ঞ আরো কিছু ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারেন

অটিজম-সংক্রান্ত সেবাকেন্দ্র

নিচে কিছু প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা উল্লেখ করা হলো যেখানে অটিস্টিক শিশুদের বাবা-মায়েরা তাঁদের শিশুদেরকে অটিজম-সংক্রান্ত সেবার জন্য নিয়ে যেতে পারেন:

১. শিশু বিকাশ কেন্দ্র

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
  ফোন ০১৭২৭২০১০৯৪
  ইমেইল dmc_principal@yahoo.com
- সিলেট এমএজি ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট, ফোন ০১৬১৭৪১৫১৯১
  ইমেইল osmanimedical@gmail.com
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
  ফোন +৮৮০২ ৯১০৪২১১-২০
  ইমেইল dhakashishu2010@gmail.com

২. ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন হাসপাতাল

৬/২ বড়বাগ, মিরপুর ২, ঢাকা
ফোন +৮৮০২ ৯০২৩৮৯৪-৫

৩. অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

বাড়ি ৩৮/৪০, রোড ৪, ব্লক-খ, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা
ফোন +৮৮০২ ৮১২১৭৫৯, ০১৫৫২৩৬৩৫৭৫
ইমেইল awf_r@yahoo.com

৪. সিআরপি, মিরপুর

প্লট এ/৫, ব্লক-এ, সেকশন ১৪, মিরপুর, ঢাকা
ফোন +৮৮০২ ৯০২৫৫৬২-৩, ০১৭৩০০৫৯৬১৪
ইমেইল dgm-mirpur@crp-bangladesh.org

৫. ইনস্টিটিউট অব নিউরো-ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ (আইএনডিঅ্যান্ডআর)

১৮ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
ফোন ০১৯৩১৪০৫৯৮৬
ইমেইল autismbd24@gmail.com

৬. অটিস্টিক চিলড্রেন'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

ঢাকা শাখা

বাড়ি ৭৪, লেইন ৩, ব্লক-ই, মিরপুর ১২, ঢাকা
ফোন +৮৮০২ ৯০৩৯২৩৮, ০১৯১৪৪০৩৩৩১/৪
ইমেইল info@acwf-bd.org

চট্টগ্রাম শাখা

মির্জাপুল, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম
ফোন ০১৮১৯৩২৪৫৭৯
ইমেইল acwfbdctg@gmail.com

৭. বিউটিফুল মাইন্ড

প্লট ১১৪৫, রোড ৬/এ, ডোলিপাড়া, সেক্টর ৫ উত্তরা, ঢাকা, ফোন +৮৮০২ ৮৯১৭৬৯৯, ০১৬৮৬৭৯৭৪৭৪
ইমেইল azizurch@agni.com

প্রতিকার

যেহেতু অটিজমের মূল কারণ এখনো অজানা তাই এর প্রতিকার সম্পর্কেও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা কিছু সাবধানতা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। যেমন:

- গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন না করা
- শিশুকে পরিবারের সবার সাথে মিশতে দেওয়া, খেলতে দেওয়া, বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেওয়া, বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি
- শিশু কোনো ভুল করলে তাকে বকা-ঝকা বা মারধর না করা
- শিশুকে টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাব প্রভৃতি ব্যবহার করতে না দেওয়া বা ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করা। কারণ এগুলো শিশুকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে দূরে রাখে এবং স্বাভাবিক উপায়ে শেখার মাধ্যমে মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়
- শিশুর রক্তের সম্পর্কের কারোর মধ্যে এই সমস্যা থেকে থাকলে শিশুর আচার-আচরণ আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে

শিশুরা সাধারণত তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে এমনিতেই শিখতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটে। কিন্তু অটিস্টিক শিশুদের মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয় না। বিশেষ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম ও আচরণ শিখিয়ে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করতে হয়। যত দ্রুত এবং সঠিকভাবে শিশুর বিকাশের ব্যবস্থা করা যায় ততই মঙ্গল। এক্ষেত্রে শিশুর বাবা-মা বা পরিচর্যাকারীর ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। সেইসাথে শিশুর ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী এবং পাড়া-প্রতিবেশিদেরও তার প্রতি সদয় হওয়া উচিত। ভদ্র ব্যবহার ও স্বাভাবিক আচার-আচরণ অটিস্টিক শিশুকে তা শিখতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে তার মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। মনে রাখতে হবে, সঠিক উপায়ে এবং সঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে একটি অসহায় অটিস্টিক শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ডেঙ্গু জ্বর: প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

নন্দিতা নাজমা, ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, গাজীপুর

কৃষি, শিক্ষা এবং প্রযুক্তিসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। স্বাস্থ্য খাতেও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। তবে এখনো বেশ কিছু ব্যাধি বাংলাদেশের মানুষের জন্য আতঙ্কস্বরূপ। এগুলোর মধ্যে ডেঙ্গু একটি। প্রতিবছর মূলত বর্ষাকালে এবং বর্ষা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেয়, বিশেষ করে ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে।

ডেঙ্গুর ইতিহাস

ডেঙ্গু-সদৃশ রোগের প্রথম মহামারী দেখা দেয় ১৭৭৯ সালে জাকার্তা ও কায়রোতে। এই মহামারীর কারণ ছিলো চিকুনগুনিয়া ভাইরাস। এরপর ১৭৮০ সালে ডেঙ্গু জ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে। ডেঙ্গু কিংবা ডেঙ্গু-সদৃশ আরো মহামারীর রিপোর্ট পাওয়া যায় উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে। তবে সেসময়ে ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা তেমন ছিলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ডেঙ্গু জ্বরের মহামারীর ধরন বদলে আরো জটিল আকারের মহামারীতে রূপ নেয়। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম-এর মতো জটিল ধরনের ডেঙ্গু জ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই বেশি ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এ-রোগে আক্রান্ত হয়েছে সাত লাখেরও বেশি মানুষ এবং মারা গেছে নয় হাজারেরও বেশি। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার প্রথম দেখা দেয় ফিলিপাইনে ১৯৫৪ সালে। এরপর ১৯৮৭ সালে ভিয়েতনামে সবচেয়ে বড় আকারে ডেঙ্গুর মহামারী ঘটে। আমাদের দেশে ১৯৬৪ সালে একবার ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেসময় এই জ্বর 'ঢাকা ফিভার' নামে পরিচিত হয়। গত দুই শতাব্দী ধরে ডেঙ্গু জ্বর বিভিন্ন নামে পরিচিত হচ্ছে, যেমন ব্রেকবোনফিভার, ড্যান্ডিফিভার, জিরাফ জ্বর, পলকা জ্বর, ৫-৭ দিনের জ্বর, ঢাকা ফিভার, ইত্যাদি।

২০১৫ সালের ১২ অক্টোবর ঢাকা ট্রিবিউনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গত বছরের ওই সময় পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিলো ২,০০০ যা ২০০৬ সালের পর থেকে সবচেয়ে বেশি। ২০০৬ সালে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিলো ২,২০০ জন, যাদের মধ্যে ১১ জন মারা যায়। তবে ২০০৭-২০১০ পর্যন্ত কোনো রোগী মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায় নি। এরপর ২০১১-২০১৪ পর্যন্তও প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এবং ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত চার জন রোগী মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ডেঙ্গু সমস্যা এখনো একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে।

রোগের কারণ

ডেঙ্গু জ্বর ভাইরাসজনিত একটি ব্যাধি। এই ভাইরাস ফ্ল্যাভি ভাইরাস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ডেঙ্গু ভাইরাসে সংক্রামিত স্ত্রী প্রজাতির *এডিস ইজিপ্টি* মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়। ১৯৪৪ সালে ডক্টর আলবার্ট সাবিন ডেঙ্গুর ভাইরাস সনাক্ত করেন এবং ডেঙ্গু-১ ও ডেঙ্গু-২ নামে দু'টো

এডিস ইজিপ্টি মশা ■ সূত্র: ফ্লিকার ক্রিয়েটিভ কমনস ■ ছবি: ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটি-জেমস গ্যাথানি CC BY-SA 4.0

ভাইরাসকে আলাদা করেন। পরবর্তীকালে আরো দু'টি নতুন ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্ত করা হয় এবং এদের নামকরণ করা হয় ডেঙ্গু-৩ ও ডেঙ্গু-৪। এই ৪ ধরনের ভাইরাসই ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঘটাতে পারে।

বাহক

এডিস ইজিপ্টি এবং *এডিস এলবোপিকটাস* নামের মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক। প্রথমটি সাধারণত শহর এলাকায় বেশি থাকে এবং *এডিস এলবোপিকটাস* গ্রামাঞ্চলে বেশি দেখা যায়, তবে শহরেও এই প্রজাতির মশা থাকতে পারে। এই মশার গায়ের উপর সাদা-সাদা ছোট-ছোট ছোপ থাকে। মশাটি মাটির সাথে সমান্তরালভাবে বসে। এই মশার আদি স্থান আফ্রিকার জঙ্গল বলে ধারণা করা হয়। সেখানে বর্ষাকালে গাছের কোটরে জমে থাকা পানিতে এরা ডিম পাড়ে। পরবর্তীকালে এই প্রজাতির মশা শহর, বন্দর বা শিল্পাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে এবং শহুরে জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। শহরের বিভিন্ন পরিত্যক্ত জিনিস যেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে, যেমন চৌবাচ্চা, ফুলের টব, ডাবের খোসা, ভাঙ্গা কাঁচের বা মাটির পাত্র, বা পড়ে থাকা খোলা কোনো প্লাস্টিক কন্টেইনার, টায়ার, ইত্যাদি *এডিস ইজিপ্টি* মশার ডিম পাড়ার আদর্শ স্থান। এই মশার ডিম ফুটে মশায় পরিণত হতে সময় নেয় ৬ থেকে ৮ দিন।

কখন কামড়ায়

এই মশা সাধারণত দিনের বেলায় কামড়ায়, বিশেষ করে খুব ভোরে এবং শেষ বিকেলে।

রোগের লক্ষণসমূহ

মশা কামড়ানোর ৪ থেকে ৭ দিনের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। ছোট শিশুদের বেলায় এই রোগ ততটা মারাত্মক আকারে দেখা দেয় না। তবে একটু বড় শিশু ও পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

ডেঙ্গু ক্ল্যাসিকাল জ্বরের লক্ষণ

- হঠাৎ করে জ্বর শুরু হওয়া (১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট)
- মাথা থেকে শুরু করে হাড়, চোখের পিছনে, মাংসপেশীতে এবং গিরায় ব্যথা
- ক্ষুধামন্দা
- সমস্ত শরীরে লাল রঙের চাকা, বিশেষ করে উর্ধ্বাঙ্গসমূহে
- রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমে যাওয়া
- জ্বর সারার পর রক্তে এন্টিবডি টাইটার বেশি পাওয়া

ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের লক্ষণ

- হঠাৎ করে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। এই জ্বর দুই পর্যায়ে হয়ে থাকে এবং দুই থেকে সাতদিন পর্যন্ত থাকে। জ্বরের সাথে মাথা ব্যথা, কাশি ও বমি হতে পারে
- এই জ্বর হঠাৎ করেই কমে যায়। কমে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে ২৪ ঘণ্টা পরবর্তী সময় পর্যন্ত সময়কে বলা হয় সংকটপূর্ণ সময়। এই সময়টি সবচেয়ে জটিল। এসময় রক্তক্ষরণজনিত উপসর্গও দেখা দিতে পারে, যেমন নাক ও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, পায়খানার সাথে রক্ত পড়া এবং রক্ত বমি হওয়া। শরীরে রক্তের চাকাও দেখা দিতে পারে

প্রথমবার ডেঙ্গু জ্বরে হেমোরেজিক জ্বর হয় না। পরবর্তী সময়ে অন্য সেরোটাইপ ভাইরাসের আক্রমণে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর হতে পারে। সাধারণত ২৪-৩৬

ঘণ্টা সময় সঠিকভাবে রোগীকে পরিচর্যা করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তের অণুচক্রিকার পরিমাণ কমে যায় এবং রক্তনালী থেকে রক্তরস বেরিয়ে টিস্যুতে জমা হতে থাকে। ফলে ফুসফুসের ঝিল্লি এবং পেটে পানি জমতে পারে এবং রক্তে এলবুমিনও কমে যেতে পারে। এসময় রক্তের ঘনত্ব বেশি হতে পারে। এ ধরনের সংকটাপন্ন সময়ে রোগীকে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম

ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের সমস্ত লক্ষণসমূহের উপস্থিতি ছাড়াও অন্যান্য কিছু লক্ষণ এই সিনড্রোমে দেখা যায়, যেমন:

- দুর্বল নাড়ী
- রক্তচাপ দ্রুত কমতে থাকা
- হাত-পা ঠাণ্ডা ও ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- অস্থিরতা বেড়ে যাওয়া

ডেঙ্গু-সদৃশ জ্বর

ডেঙ্গু জ্বরের মতো উপসর্গবিশিষ্ট চিকুনগুনিয়া জ্বরও মহামারী আকারে দেখা দেয়। ডেঙ্গুর মতো চিকুনগুনিয়া ভাইরাসও এডিস মশা দ্বারা বাহিত। দক্ষিণ এশিয়ায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব একই সাথে ঘটে থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটছে তার সবগুলোই ডেঙ্গু নয়, সাথে চিকুনগুনিয়া জ্বর থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে।

রোগ নির্ণয়

রোগের শুরুতেই এই রোগ নির্ণয় করা কঠিন। জ্বর শুরু হওয়ার পর থেকেই রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। এতে দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যায় এবং মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে আসে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোম নির্ণয়ের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এটি দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে এবং রোগ নির্ণয় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকিও কমে যায়।

ডেঙ্গু জ্বরের ক্লিনিকাল বৈশিষ্ট্য

- উচ্চমাত্রায় জ্বর (১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)
- ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ (অল্প অথবা বেশি)

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়:

- অণুচক্রিকার (platelet) সংখ্যা ১ লাখ কিউবিক মি.মি. অথবা তার কম
- রক্ত কণিকার ঘনত্ব (haematocrit) ৫৫% বা তার বেশি
- রক্তে এলবুমিনের পরিমাণ কমে যায়
- ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে উপরের বৈশিষ্ট্যের সাথে হাইপোটেনশন যুক্ত হয় অর্থাৎ রক্তচাপ পারদযন্ত্রে ২০ মি.মি. বা আরো কম হয়

উল্লেখিত প্রথম দু'টি ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য এবং একটি ল্যাবরেটরি পরীক্ষা যদি পজিটিভ হয় বা হিমাটোক্রিটের মাত্রা যদি বেড়ে যায়, তাহলে তাকে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর বলা হয়।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর যেসব ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা প্রয়োজন সেগুলো হলো:

- ডেঙ্গু স্পট টেস্ট
- ডেঙ্গু এনএস১ অ্যান্টিজেন (NS1 antigen) টেস্ট
- রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাপ (platelet count)
- রক্ত কণিকার ঘনত্বের (haematocrit) পরিমাপ
- রক্তে ডেঙ্গু ভাইরাসের এন্টিবডি টাইটার-এর পরিমাপ

ব্যবস্থাপনা

ডেঙ্গু জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ দিতে হবে। কখনোই এসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম বা আইবুপ্রোফেনজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না। এগুলোতে রক্তক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া, রে'স সিনড্রোম (Reye's syndrome) নামে এক ধরনের মারাত্মক অবস্থাও দেখা দিতে পারে। রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ও তরল খাবার খেতে দেওয়া প্রয়োজন এবং তাকে সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরই সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তক্ষরণ শুরু হয়; এসময় ৪৮ ঘণ্টা রোগীকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। জ্বর সেরে যাওয়ার পর ৭ দিন সুস্থভাবে পার হলে বোঝা যাবে এবারকার মতো রোগী সুস্থ হয়ে গেছে। আবার যাতে মশায় কামড়াতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। জ্বর সেরে যাওয়ার পর রোগীর যদি নাক, মাড়ি বা শরীরের যেকোনো স্থান থেকে রক্তপাত শুরু হয় অথবা প্রচণ্ড পেটব্যথা হয় কিংবা ত্বকের নিচে লালচে ছোপ দেখা যায়, তবে সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর জন্য শিরায় স্যালাইন, রক্ত সঞ্চালন বা অণুচক্রিকা সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে।

রোগী কখন হাসপাতাল ত্যাগ করবে এ-ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক একটি নীতিমালা নির্ধারণ করা আছে। সে অনুযায়ী যে অবস্থায় রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারে তা হলো:

- জ্বর কমানোর ওষুধ ছাড়াই যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে জ্বর আর না আসে
- খাওয়ার রুচি ফিরে আসলে
- রোগীর উপসর্গ লক্ষ করে সুস্থ মনে হলে
- প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসলে
- হিমাটোক্রিটের মাত্রা স্থিতিশীল হয়ে এলে
- রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি থাকলে
- ফুসফুসে পানি জমার অথবা পেটে পানি জমার কারণে শ্বাসকষ্ট না থাকলে
- রোগী শক থেকে সেরে ওঠার দুই দিন অতিবাহিত হলে

প্রতিরোধ

ডেঙ্গু জ্বরের কোনো প্রতিষেধক ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় প্রতিরোধই এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়। ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ আছে। এই চারটির যেকোনো একটি থেকেই ডেঙ্গু জ্বর হয়। একবার কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠলে যে ভাইরাস দ্বারা সে আক্রান্ত হয়েছিলো ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে তার আজীবন প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে বাকি তিনটি সেরোটাইপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় না। ফলে তার আরো তিনবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেকারণেই একবার ডেঙ্গু জ্বর থেকে সেরে ওঠার পরও মশার কামড় থেকে রক্ষা পেতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস মশা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন মাটির হাঁড়ি, ফুলের টব বা অন্য কোনো কিছুতে পানি জমতে না দেওয়া এবং অব্যবহৃত কৌটা, ড্রাম, বা নারকেলের মালার মতো কোনো কিছু থাকলে তা দূরের ডাস্টবিনে ফেলে আসা এবং কোনো স্থান ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে হতে না দেওয়া। কারণ কোনো কিছুতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। বাড়ির আশপাশ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। ফ্রিজের নিচে এবং এয়ারকুলারের পানি যে পাত্রে জমা হয় তা সর্বদা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। মশা নিধনের জন্য বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত মশার কয়েল, ম্যাট ও স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে, এমনকি দিনের বেলায়ও। মশার উপদ্রব টের পেলে দিনের বেলায়ও মশা নিধনের সব ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের দরজা ও জানালায় মশা প্রতিরোধক জাল দেওয়া থাকলে ভালো হয়। ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য আরো যা করা যেতে পারে তা হলো:

- সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের উপায় এবং জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরা
- ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে মশারীর মধ্যে রাখা
- ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা না কমা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত খবরের কাগজে খুব প্রয়োজনীয় পরামর্শগুলো ছাপানো। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, যেমন ফেসবুক, টুইটার, ভাইবার, ইত্যাদির মাধ্যমেও জনসচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে
- প্রতিবছর সিটি কর্পোরেশনগুলোতে মশক নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা
- শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় ইমাম সাহেব মানুষকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমেও জনসচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে
- মহামারীর সময় কন্ট্রোল রুম খুলে কেন্দ্রীয়ভাবে তা সমন্বয় করা দরকার এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে ডেঙ্গু প্রতিরোধের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান

যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।

ISSN 1021-2078